Radio Serial - Episode 49 –Disaster and Resilient Structure (Urban and Rural)

পর্ব ৪৯ - ঘূর্ণি হাওয়া

গবেষণা, রচনা ও বেতার নাট্যরূপ – সায়েন্স কমিউনিকেটরস ফোরামের পক্ষ থেকে ছন্দা মুখোপাধ্যায়

চরিত্র – চন্দন, সুবল (মৎস্যজীবী), অর্ণব, সায়ন (কলেজ পড়ুয়া), মল্লিকা (বাছুনি) ও গুপি (জালিয়া)।

প্রথম অংশ

(কলকাতা শহরের পথ, গাড়ির শব্দ, হকারের হাঁকডাক)

অর্ণব : সায়ন, এবার তো বড়দিন আর নিউ ইয়ার মিলে এক সপ্তাহের ছুটি, কি করবি ভেবেছিস?

সায়ন : চল কোথাও ঘুরে আসি।

অর্ণব : সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাবি?

সায়ন : সমুদ্র মানে তো সেই দিঘা কিম্বা পুরী। সর্বত্র ভিড় গিজগিজ করছে। তার থেকে নিজের ঘরে বসে কানে ইয়ারফোনগুঁজে চুপচাপ গান শোনা ভালো।

অর্ণব : আমি তোর সঙ্গে একমত। ভিড় দেখতে হলে চিড়িয়াখানায় গেলেই হয়, এত রাস্তা পেরিয়ে দিঘা বা পুরী যাওয়ার দরকার কি? এবার কিন্তু একটা অন্যরকম বেড়ানোর কথা ভেবেছি।

সায়ন : সেটা কি রকম?

অর্ণব : কাঁথিতে আমার এক মামা থাকে, তার নাম রঞ্জনমামা। আর কাঁথি থেকে সমুদ্র কয়েক কিলোমিটার দূরে।

সায়ন : আইডিয়াটা ভালো। কিন্তু অর্ণব, কাঁথি গিয়ে তোর রঞ্জনমামার বাড়িতে বসে থাকবোনা। কয়েক কিলোমিটার দূরে না থেকে সমুদ্রের ধারে কোথাও থাকা যায় না?

অর্ণব : শোন, আমার হোমওয়র্ক করা হয়ে গেছে। মামার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি কাল রাতে। বলেছে সমুদ্রের ধারে একটা গ্রামে থাকার ব্যবস্থা করে দেবে।

সায়ন : ওঃ, দারুন আইডিয়া। কিন্তু ওখানেও তো গিয়ে দেখবো গিজগিজ করছে টুরিস্ট।

অর্ণব : কোনো চান্স নেই। রঞ্জনমামা যে গ্রামের কথা বলছে সেটা মৎস্যজীবীদের গ্রাম, সেখানে সমুদ্র থেকে মাছ ধরে শুকনো করা হয়। শুকনো মাছের গন্ধ বেড়াতে যাওয়া লোকেরা নাকি মোটে পছন্দ করে না। কিন্তু সমস্যা তোকে নিয়ে। তুই আবার শুঁটকি মাছের গন্ধে পালিয়ে যাবিনা তো?

সায়ন : আরে না না, আমি বৈঠকখানা বাজারের রাস্তা দিয়ে শেয়ালদা স্টেশনে যাই। সেখানে ম ম করছে শুঁটকির গন্ধ। ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।

দ্বিতীয় অংশ

(সমুদ্র উপকুলে মৎস্যজীবীদের গ্রাম, ঢেউ ও বাতাসের শব্দ, মৎস্যজীবী মানুষের কথাবার্তা)

অর্ণব : এই দেখ সায়ন, এ হল চন্দনদা, সমুদ্রের ধারে এই গ্রামে থাকে। রঞ্জনমামা এর কথাই বলেছিল। আমি ওকে খুঁজে আনলাম লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে।

সায়ন : চন্দনদা, আমরা দুজনএই গ্রামে কোথাও একটা থাকার জায়গা পাবো?

চন্দন : থাকার জায়গা হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে কয়েকটা কথা বলে দি তোমাদের। এটা কিন্তু গ্রাম নয়, প্রতি বছর আশ্বিন-কার্তিক থেকে ফাগুন মাস পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রামের লোক এখানে বাসা বেঁধে থাকে মাছ ধরার জন্য। তারপর তারা সেই অস্থায়ী ঘর ছেড়ে আবার নিজেদের গ্রামে ফিরে যায়। তাই এই জায়গাটাকে গ্রাম বলেনা, একে বলে খোটি। এইরকম অনেক খোটি আছে সমুদ্রের ধারে – এই খোটির নাম নারায়নপুর।

সায়ন : তার মানে তোমরা প্রতি বছর ক্যাম্প করে থাক সমুদ্রের ধারে? দারুন মজা হয় নিশ্চয়?

চন্দন : মজা? কদিন থেকেই দেখনা, বুঝবে কিরকম মজা। সারাদিনরাত কাজ আর কাজ, কখনও মাছ পাওয়া যাচ্ছে, কখনও আবার জাল ফাঁকা। মাছ পাওয়া গেলে তারপরেও কাজ। সেই মাছ শুকিয়ে, ঝেড়ে বেছে বিক্রি করতে হয় পাইকারদের কাছে। আজ যেমন মেঘলা আবহাওয়া, ঝড় বৃষ্টি হবে খবর আছে– এইরকম হলে আরেক বিপদ। মাছ সময়মত না শুকোলে খারাপ হয়ে যাবে।

অর্ণব : আমরা তোমাদের সঙ্গে থাকবো এই খোটিতে? তাহলেভালোই হবে, সকাল থেকে রাত তোমরা কি কর সব দেখতে পাব।

চন্দন : ঠিক আছে, দেখবে না হয়। এখন চল আমাদের বাসাতে, সেখানে কিন্তু আমরা দশজন মানুষ একটা ঘরে থাকি। রেঁধে বেড়ে খাই। তোমরা শহরের লোক, তোমাদের এত কষ্ট করা অভ্যেস নেই, অসুবিধে হতে পারে।

সায়ন : অসুবিধে আবার কি? আমরা তো আর চার ছ'মাস থাকছি না, মোটে কটা দিন। বেশ মজা করে কাটিয়ে দেবো।

তৃতীয় অংশ

(খোটিতে চন্দনদের বাসা, ঢেউ ও বাতাসের শব্দ এখানে মৃদুভাবে শোনা যায়। কড়াইতে খুন্তি নাড়ার আওয়াজ, বাসায় রান্না হচ্ছে)

চন্দন : অর্ণব, সায়ন – তোমরা ভেতরে এসো, এই হল আমাদের বাসা। তোমাদের ব্যাগ একধারে রেখে দাও। সুবলদা– এরা দুজন কলকাতা থেকে এসেছে আমাদের খোটি দেখতে। এরা হল রঞ্জনবাবুর ভাগ্নে। আর এ হল সুবলদা, আমার মামাতো দাদা – আমরা এক সঙ্গে মাছ ধরার ব্যবসা করি।

অর্ণব : ও, তুমি সুবলদা, তোমার কথাও মামা বলেছিল। বলছিল তুমি সমুদ্রে কিভাবে মাছ ধরা হয় সব বুঝিয়ে দেবে।

চন্দন : তা দেবে। সুবলদাকে আমরা বলি মাস্টারমশাই। আমরা অনেক কাজ না বুঝে করি, সুবলদা আমাদের সব কিছুর মানে বুঝিয়ে দেয়।আমি দেখেছি বুঝতে পারলে কাজটা আরও ভালোভাবে করা যায়।

সুবল: বোসো বোসো। অনেক দূর থেকে এসেছ, একটু জিরিয়ে নাও। তারপর ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখা যাবে।

সায়ন : আচ্ছা চন্দনদা, সুবলদা, তোমরা আমাকে একটা জিনিস বুঝিয়ে দাও। এই যে একটা ঘরে বসে আছো বাঁশের খুঁটি আর বাঁশের খাঁচার ওপর কি একটা শুকনো পাতার ছাউনি, এটা তো যে কোন সময়ে সমুদ্রের হাওয়ায় উড়ে যাবে। তোমাদের এই ঘর কি মাঝে মাঝে উড়ে যায়?

(চন্দন জোরে হেসে ওঠে)

চন্দন : এই যে সুবল মাস্টার, ভালো ছাত্র পেয়েছ। এবার বোঝাও বাসা কেন হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছেনা।

সুবল : হাসির কিছু নেই। ওরা শহরে পাকা বাড়িতে থাকে, তাই ওদের মনে হতে পারে ঘর পাকা নয় তাও দাঁড়িয়ে আছে কি করে। অর্ণব আর সায়ন, তোমরা ভালো করে এই ঘরটা দেখো। লক্ষ্য কর এটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। সমুদ্রের জল যেখানে আসে, যাকে বলা হয় বিচ, সেখানে শুধুই বালি। সেই বালির ওপর কখনও ঘর বানানো হয় না, তার ভিত মজবুত হবে না। কারন বালি বা নরম মাটি তলা থেকে সরে যাবে, ঘরের ভিত দুর্বল হয়ে যাবে।

চন্দন : বাচ্চারা জলের ধারে বালি দিয়ে ঘর বানায়, একটু পরে জোয়ারের জল সেই ঘর ধুয়ে নিয়ে যায়। সেই অবস্থা হবে বালিতে ঘর বানালে।

সুবল : চন্দন ঠিক বলেছে। সেই জন্য সব সময় ঘর বানানো হয় বালির পাড় ছেড়ে আরও উঁচুতে মাটির ওপর। তাহলে সবথেকে বড় জোয়ারের জলও তাকে ছুঁতে পারবেনা, ঝোড়ো হাওয়া তাকে হেলাতে পারবেনা কারন ঘরটা দাঁড়িয়ে থাকবে শক্ত জমির ওপরে।

অর্ণব : এই বাঁশ আর শুকনো পাতার ঘর ঝোড়ো হাওয়া সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকবে?

চন্দন : এই বাঁশ আর হোগলা পাতার তাকত জানো? যদি ঘন্টায় আশি কিলোমিটার বেগে ঝড় আসে তাহলেও এই বাসা দাঁড়িয়ে থাকবে, শুয়ে পড়বে না। আজ ঝড়ের পূর্বাভাষ আছে, হাওয়া বইছে অন্যদিনের থেকে জোরে। এখানে বসে কিছু বুঝতে পারছ?

সুবল : এই ঘরটা দেখো ভালো করে। এখানে ব্যবহার করা প্রত্যেকটা জিনিস হালকা এবং বহনযোগ্য। এগুলো আমাদের বয়ে আনতে হয় পনেরো-বিশ কিলোমিটার দূরের গ্রাম থেকে।

সায়ন : কিভাবে আনা হয় এতো জিনিস অতো দূর থেকে?

চন্দন : বাবার কাছে শুনেছি অনেক আগে লোকেরা গ্রাম থেকে যাতায়াত করতো আর রাত্রে যেমন তেমন একটা মাথা গোঁজার ঠাই করে নিতো। রাস্তাঘাট হওয়ার পরে চারচাকার ট্রাকে করে মালপত্র আসে। আজকাল থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাটা আগের থেকে ভালো হয়েছে।

সুবল : যে কথা হচ্ছিল। ঘর তৈরির জন্যে প্রথমে মাটিতে দাগ দিয়ে সেই মাপে জমিটা সমতল করে নেওয়া হয়। তারপর বাঁশের খুঁটি পুঁতে দেওয়া হয় গভীর করে। সেই খাড়া বাঁশের সঙ্গে আড়াআড়ি বাঁশ বেঁধে দেওয়া হয় দড়ি দিয়ে শক্ত করে। ঘরের মাথাটাও একই ভাবে তৈরি হয়েছে সোজাসুজি আর আড়াআড়ি বাঁশ বেঁধে। এইভাবে যে খাঁচা বা কাঠামো তৈরি হল সেটাই ঘরটাকে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি দিচ্ছে।

সায়ন :সুবলদা, বাঁশের কাঠামো করে তোমাদের এই বাসা নাহয় শক্ত হল। কিন্তু এই বাসায় তো বছরে চার কিম্বা পাঁচ মাস থাকো। তোমাদের গ্রামে যে মাটির বাড়িতে থাকো, সেটার কাঠামো কি করে শক্তপোক্ত করে বানাও?

সুবল: আমাদের গ্রাম সমুদ্র উপকূল থেকে বেশি দূরে নয়, সেখানেও বছরে কয়েকবার হানা দেয় নিম্নচাপ আর ঘূর্ণিঝড়। তাই গ্রামের ঘরগুলোও মজবুত করে বানাতে হয়। আর ঝড়ের

সঙ্গে আছে বন্যা, বেশি বৃষ্টি হলে খেতের ফসল আর বাস্তু সব চলে যাবে জলের তলায়। তাই ঘর তৈরি হবে উঁচু জমিতে, এলাকা নিচু হলে মাটি ফেলে জমি উঁচু করে তৈরি করে নিতে হবে ভিটে।

সায়ন: আরকাঠামো? মাটির ঘরের কাঠামো কিরকম হবে?

সুবল: কাঠামোও বানাতে হয়। আজকাল অনেকে পাকা ঘর করে, সিমেন্ট আর লোহা দিয়ে ঢালাই করে কলাম আর বিম করে নেয়। সাবেক নিয়মে ঘর বানালে মাটির দেওয়াল খুব চওড়া করে করা হয়, গোড়াটা বেশি মোটা আর ওপরটা সরু। দেওয়াল পাতলা হলে কাঠ আর বাঁশের খাঁচা রাখা হয় দেওয়ালের ভেতরে আর অবশ্যই ঘরের চালে।

অর্ণব : এইসব নিয়ম মেনে কে নকশা বানায়? এতো রীতিমতো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং।

সুবল: গ্রামের লোকেরা খানিক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং জানে বইকি। তারা বিশ-পঞ্চাশ তলা বাড়ি বানাতে পারেনা বটে, কিন্তু তাদের তৈরি অধিকাংশ ঘরবাড়ি ঝড়-ঝঞ্ঝায় দিব্যি খাড়া থাকে।

চন্দন : আমিও কিছু কিছু নিয়ম জানি। গত বছর আমার দাদার বিয়ে হল, তাই নতুন ঘর বানানো হল। তখন আমিও হাত লাগিয়েছিলাম। ঘরের চালের যে কাঠামো বানানো হয় আর ওপরে যে ছাউনি দেওয়া হয়, সেগুলো বেশি ভারি করা হয় না। মাথাভারি হলেঘর কমজোরি হয়ে যাবে। তাই আমরা টালি না লাগিয়ে ঢেউ টিন লাগালাম। এতকাল তো অনেকেই খড়ের ছাউনি দিতো।

অর্ণব : তোমাদের এই বাসায় ছাদ তো হোগলা পাতা দিয়ে বানিয়েছ, মনে হচ্ছে এর কোন ওজনই নেই।

চন্দন : ওজন কম হলেও চাপ নিতে পারে। তোমরা ছাউনিটা ভালো করে দেখো। হোগলা পাতা দিয়ে চাটাই বুনে সেটা বাঁশের কাঠামোর সঙ্গে দড়ি দিয়ে ভালো করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

সুবল : ঘরের চাল যেমন তেমন বানিয়ে দিলে হবে না। মাটির সঙ্গে মেপে কুড়ি থেকে তিরিশ ডিগ্রী কাত করে রাখলে সেই চাল ঝড়ের সঙ্গে ভালো মোকাবিলা করবে। তার পরেও চালের পুরো ওজনটা দেওয়ালের ওপর চাপিয়ে না দিলে ভালো, কারন কাঠামোটার ওজন কম নয়।

চন্দন : তো উপায়?

সুবল : তাই অনেকসময়ে ঘরের মাঝখানে খুঁটি লাগিয়ে ছাদের ওজনটা মাটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, বিশেষ করে ঘরটা যদি বড় মাপের হয়। কিন্তু একটা ঘর বেশি বড় করা উচিত নয়, যেকোনো একটা দেওয়াল সাত মিটার বা তেইশ ফুটের থেকে বেশি লম্বা হলে সে বাতাসের চাপ এবং নিজের ওজনে দুর্বল হয়ে যাবে।

সায়ন : একদম ঠিক।

সুবল : তাই উচিত হচ্ছে একটা বড় ঘর না বানিয়ে একাধিক ছোট ঘর বানানো। আরও ভালো যদি ঘরগুলোর মধ্যে একটু ফাঁক রাখা যায়। শুধু ঝড় আর বন্যানয়, ভূমিকম্পের সময়ও দেখা যায় ছোট ঘর বেশি টেঁকসই।

সায়ন : আমি শুনেছি ঘর হালকা হলে ভূমিকম্পের সময় সেই ঘর সহজে ভেঙ্গে পড়েনা। তাই জাপানে হালকা কাঠের বাড়ি বানানো হয়।

সুবল: শুধু জাপান কেন? আমাদের দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ওইরকম বাড়ি বানানো হয় বহুকাল আগে থেকে।

চন্দন : আমি বছর দুয়েক আগে একবার আসাম গিয়েছিলাম। সেখানে জাগিরোড বলে একটা জায়গায় শুকনো মাছের পাইকারি বাজার আছে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের উপকূল অঞ্চল থেকে অনেক শুকনো মাছ যায় সেই বাজারে। আমি একটা মাছের ট্রাকে চড়ে বসেছিলাম। আসামের ঘরবাড়ি আমার তো বেশ ভালো লেগেছে। কাঠের ফ্রেম আর পাতলা দেওয়াল। তার ওপরে টিনের চারচালা ছাদ।

সুবল : হ্যাঁ, ওই দেওয়ালগুলো আগে তৈরি হত কাঠির ওপরে মাটির প্রলেপ দিয়ে। তারপর এল সিমেন্ট। আজকাল অনেকে লোহার তারজালের ওপরে সিমেন্ট করে নিচ্ছে। ওই ঘরগুলো অত্যন্ত হালকা, ভূমিকম্পের সময় সহজে ভাঙ্গবে না। যদি কারোর ওপর ভেঙ্গে পড়ে, সে আহত হবে – কিন্তু মারা যাবার আশঙ্কা কম থাকবে।

অর্ণব : আচ্ছা সুবলদা, তুমি তো শুধু ঘরের দেওয়ালের কথা বলছ, তোমরা খোটিতে বা গ্রামের বাড়িতে দরজা জানলা কিভাবে বসাও?

সুবল : খোটিতে বাসা বানানোর সময় দরজা রাখা হয় একটু নিচু করে। আমাদের বাসায় ঢোকার সময় মাথা একটু নুইয়ে ঢুকতে হয়েছিল মনে আছে? চারপাশে তাকিয়ে দেখো, অধিকাংশ বাসায় দরজা সমুদ্রের দিকে মুখ করে নেই। হয় পেছন ফিরে বা পাশ করে। জানলা তো রাখাই হয় না।

সায়ন : ওই জন্য তোমাদের বাসার মধ্যে ঝুপসি মত অন্ধকার। ভাগ্যিস হোগলা পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে আলো ঢোকে, তাই সব দেখতে পাওয়া যায়।

চন্দন : আজ আবহাওয়া ভালো না, রোদ ওঠেনি সকাল থেকে। তাও সব দেখা যাচ্ছে। গ্রামের ঘরে অবশ্য জানলা থাকে। আলোও আসে, হাওয়াও আসে।

সুবল : স্থায়ী ঘরে জানলা বসানোর নিয়ম মুখোমুখি, তাহলে ঘরে হাওয়া খেলবে – একদিক থেকে ঢুকে অন্যদিকে বেরিয়ে যাবে। আর দরজা জানলা হবে দেওয়ালের মাঝামাঝি, কোন একদিক ঘেঁসে নয়। তাহলে দেওয়াল মজবুত হবে।

চন্দন : সুবলদা, তোমার রান্না করা হয়ে গেছে? চল এখন গাঙের ধারে যাই। আজ আবহাওয়া মোটেও ভালো না।

সুবল : হ্যাঁ, হয়ে গেছে। চলো, ঘুরে আসি গাঙের ধারে। আমরা কিন্তু সমুদ্রকে গাঙ বলি।

অর্ণব : আমরাও বলি। সমুদ্রের পাখি সি-গালকে তো বাংলায় গাঙ-চিল বলে।

চতুর্থ অংশ

(ওরা চারজন বাসা থেকে বেরিয়ে জলের দিকে যায়। ফলে আবহ শব্দের তারতম্য হয়। বাতাস এবং ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ প্রবলতর হয়, প্রত্যেককেই কথা বলার জন্য একটু জোরে শব্দক্ষেপণ করতে হয়)

অর্ণব : তা হলে জানলা বসাবার সময়....

সুবল : সে সব পরে হবে। এখন আকাশের দিকে দেখো। দক্ষিণ দিকে কালো মেঘ জমছে, বাতাসটাও সকালের থেকে অনেকটা জোরে বইছে। ঝড় আর বৃষ্টি হবে ভালো রকম। মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে রেডিওতে। তাই আজ কোন নৌকো গাঙে নেই।

সায়ন : যদি কেউ রেডিও না শোনে আর ভুল করে সমুদ্রে চলে যায়? তারা তো মহা বিপদে পড়বে।

চন্দন : মৎস্যজীবীরা খেতে ভুলে যায় কিন্তু আবহাওয়ার খবর শুনতে ভোলে না। সব নৌকো ফিরে এসেছে, এখন সবাই মিলে নৌকোগুলোকে জলের ধার থেকে আরও উঁচু জায়গায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে কারন বড় বড় ঢেউ আসবে। ওই জন্যে আমাদের বাসায় আমরা দুজন ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাওনি। আমাদের সঙ্গে যারা কাজ করে সবাই এখন ব্যস্ত।

মল্লিকা (কণ্ঠস্বর দূর থেকে ক্রমশ কাছে আসে) : চন্দনদা, এখনও খোলা থেকে সব মাছ তুলতে পারিনি। আজ অনেক বাছুনি কাজে আসেনি।

সুবল : আমি জালিয়াদের বলে দিয়েছি নৌকো জাল সামলে তোমাদের সাহায্য করতে। তারা এতক্ষণে পৌঁছে গেছে হয়তো।

চন্দন : বাছুনিরা আজ আসেনি কেন?

মল্লিকা : ঝড় বৃষ্টি হবে শুনে ঘরদোর সামলাচ্ছে বোধহয়।

সুবল : ঠিক আছে, তুমি এখন যাও। হাত চালিয়ে কাজ করো, বৃষ্টি শুরু হতে দেরি নেই।

চন্দন : (চেঁচিয়ে, মল্লিকার উদ্দেশে) দক্ষিণের আকাশ কালো হয়ে গেছে, আধ ঘন্টার মধ্যে জল এসে যাবে কিন্তু।

অর্ণব : বাছুনি, জালিয়া এই সব কি চন্দনদা?

চন্দন : এখানে নানা রকম কাজ থাকে, তাই আলাদা আলাদা পোস্ট। যার নামে এই ব্যবসা, সে হল লায়া। সে আমাদের সকলকে হুকুম দেবে কি করতে হবে। আমাদের দলে সুবলদা হচ্ছে লায়া। আমি হলাম ম্যানেজার। ব্যবসার দিকটা আমাকে দেখতে হয়। লায়া আর ম্যানেজার কিছু লোককে কাজে নিযুক্ত করে মাইনে দিয়ে, তারা নৌকো চালায়, গাঙে জাল পাতে, জাল তোলে, মাছ ডাঙায় নিয়ে আসে। তারা হল জালিয়া। যে লোক বাসায় সকলের জন্যে রান্না করে সে রসিয়া। আর বাছুনি হয় মেয়েরা, তারা আশেপাশের গ্রাম থেকে আসে। তাদের কাজ হল শুকনো মাছ জাত আর সাইজ হিসেবে বেছে আলাদা করা।

সুবল : চলো, দেখে আসি সব কাজ হল কিনা। পা চালিয়ে চলো।

চন্দন : তোমরা এগোও, আমি রেডিওটা নিয়ে আসি। আবহাওয়ার খবর শুনতে হবে।

পঞ্চম অংশ

(ঝোড়ো বাতাসের শব্দ, ঢেউয়ের শব্দ তীব্রতর। কথা বলছে অনেকে, তাদের সব কথা স্পষ্ট নয়, কিন্তু বোঝা যায় তারা অনেকে মিলে ব্যস্তভাবে কাজ করছে)

মল্লিকা : আমরা মেয়েরা তখন থেকে খেটে মরছি, জালিয়া লোকদের এখন আসার সময় হল। এই গুপি – হাত লাগা, তাড়াতাড়ি কর। ঝড় জল এসে যাবে এখনই।

গুপি : আমরা কি এতক্ষণ বসে ছিলাম নাকি? জাল নৌকো গুছিয়ে তুলে তবে আসছি।

(একটু দূর থেকে সুবল, চন্দন, অর্ণব ও সায়নের কথা শোনা যায়। তারা ক্রমশ কাছে আসছে)

সুবল : আর কটা বস্তা তুলতে বাকি আছে? গুপি, মাধব – একটু হাত চালাও তোমরা। হ্যাঁরে চন্দন, কদিন আগে গুদাম ঘরে বৃষ্টির জল পড়ছিল। প্লাস্টিক দিয়েছিস ঠিক করে?

চন্দন : হ্যাঁ, পরশুদিন রেডিওতে ঝড়ের খবর দিতেই আমরা প্লাস্টিকের ছাউনি দিয়ে দিয়েছি ভালো করে।

সুবল : তাহলে সবই ঠিক আছে মনে হচ্ছে। এখন বাবাসাহেবের দয়া।

সায়ন : বাবাসাহেব কে? তোমাদের গুরু? এখানেই থাকেন?

চন্দন : বলতে পারো তিনি এখানেই থাকেন। আমরা মৎস্যজীবীরা,সে হিন্দু হোক বা মুসলমান, সকলে তাঁকেই মেনে চলি, বিপদে আপদে তাঁকে স্মরণ করি। বাবাসাহেব অনেক কাল আগের এক পীর, শোনা যায় তাঁর অনেক ক্ষমতা। আমরা প্রতি বছর তাঁর মাজারে চাদর চড়িয়ে তবে মাছ-ব্যবসা শুরু করি। ঝড় তুফান এলে বলি 'বাবাসাহেব রক্ষা করো'। আবার মাছের সিজন শেষ হলে তাঁকে প্রণাম করে আসি।

সুবল : সবকটা বস্তা ঢুকেছে ঘরে, এবার জালগুলো তুলে দে। ঠিকভাবে গুছিয়ে রাখ, চলাফেরার পথ খোলা থাকে যেন।

অর্ণব : তোমাদের এখানে দেখছি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বাবাসাহেব ভাব করিয়ে দিয়েছেন। সব জায়গায় যদি এইরকম হতো।

সুবল : যারা একসঙ্গে ঝড় তুফানে পড়ে তাদের মধ্যে ভাব হয়ে যায়, ঝগড়া করার সময় থাকেনা তাদের। যাদের রোদে পুড়ে জলে ভিজে পেটের ভাত জোটাতে হয়না, তারাই লড়াই-ঝগড়া করে।

(মাটিতে ও গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়ার শব্দ)

সায়ন : এইরে, বৃষ্টি এসে গেল। আর এলোমেলো হাওয়া। ভাগ্যিস তোমাদের সব জিনিস ঘরে তোলা হয়ে গেছে।

চন্দন : এবার তোমরা বাসায় চলো। গুপি আর মাধব কোথায় গেলো? সবাই চলে এসো।

(কলরব – সকলে ঝড় তুফান বিষয়ে কথা বলছে, কন্ঠস্বর ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে)

ষষ্ঠ অংশ

(সুবলদের বাসা, হোগলার চালে হালকা বৃষ্টির শব্দ, ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ, বাসনপত্র গুছিয়ে রাখারআওয়াজ, রেডিওতে গানের অনুষ্ঠান চলছে)

চন্দন : রেডিওতে বলল ঝড় উড়িষ্যার দিকে সরে গেছে, কিন্তু এখানে বৃষ্টি চলবে আরো দুদিন।

সুবল : তার মানে আরো দুদিন গাঙে যাওয়া যাবে না।

চন্দন : বেচারা অর্ণব আর সায়ন, তোমাদের বেড়ানোটা মাটি হয়ে গেলো। এখানে বসে কালো আকাশ আর গাঙের কালো জল দেখো।

অর্ণব : তোমাদের সঙ্গে বাসায় বসে কথা বলতেও বেশ ভালো লাগছে। তোমাদের জগতটা কত অন্যরকম। কলকাতায় বসে আমরা ভাবি সব জেনে গেছি, এখানে এসে জানলাম আমরা কত কিছুই জানিনা।

সায়ন : ঠিক বলেছিস অর্ণব।

সুবল : আমার চিন্তা হচ্ছে উড়িষ্যার মানুষদের জন্যে। আমরা ঘরপোড়া গরু, অন্য গাঁয়ে ধোঁয়া উঠছে দেখলে বুঝতে পারি তাদের কি অবস্থা। কত গরীব মানুষের রুজি রোজগার তছনছ করে দিয়ে যায় একটা ঘূর্ণিঝড়।

চন্দন : এই বছর কয়েকআগে একটা ঝড় হল উড়িষ্যায়, মৎস্যজীবীদের খুব ক্ষতি হয়েছিল সেবার। বেশ কিছুদিন ওদিক থেকে বালিঘাই পাইকারি বাজারে মাছ আসেনি।

সুবল : সেটা ২০১৪ সাল,ওই ঝড়ের নাম ছিল হুদহুদ। সেই ঝড় বেশি ক্ষতি করেছিল অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তর আর উড়িষ্যার দক্ষিণদিকে। সেইবার বাতাসের সবথেকে বেশি গতি ছিল

ঘন্টায় ১৮৫ কিলোমিটার। ঝড় আর বৃষ্টির ধাক্কা পৌঁছে গেছিল পূর্ব উপকূল থেকে উত্তর প্রদেশ হয়ে নেপালের পাহাড়ে।

সায়ন : বাপরে! কি ভয়ঙ্কর ঝড়! পূর্ব উপকূলে কি অবস্থা হয়েছিল ভাবতেই ভয় করছে।

সুবল : বিশাখাপট্টনম শহর, বিজয়নগরম আর শ্রীকাকুলাম জেলায় সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়েছিল। সরকারি হিসেবে মৃতের সংখ্যা ছিল ১২৪ জন। তাদের অধিকাংশ অন্ধ্রপ্রদেশ আর নেপালের অধিবাসী।

অর্ণব : বলো কি? বঙ্গোপসাগরের ঝড়ে নেপালে অনেক মানুষ মারা গেলেন? তাহলে যে রাস্তায় ঝড় গেলো, সেখানে অত ক্ষতি হলনা কেন?

সুবল : নেপালে ঝোড়ো বাতাসের ফলে পাহাড়ের গায়ে জমা বরফ গড়িয়ে আসে উপত্যকার গ্রামে – যাকে বলে হিমানী সম্প্রপাত।

অর্ণব : জানি। টেলিভিশনে দেখেছি অ্যাভাল্যাঞ্চের ছবি। বরফের বন্যা সামনে যা পায় গুঁড়িয়ে আর উড়িয়ে নিয়ে যায়।

চন্দন : সেবার কিন্তু উড়িষ্যায় বেশি ক্ষতি হয়নি। আমার যতদূর মনে আছে একজনও মারা যায়নি ওখানে।অথচ আগে ঘূর্ণিঝড়ে ওই রাজ্যে অনেকে মারা গেছেন শুনেছি।

সুবল : ঠিকই শুনেছিস। ১৯৯৯ সালে একটা ভয়ঙ্কর ঝড় হয়েছিল উড়িষ্যায়। সেই ঝড় যারা দেখেছেন তারা এখনও ওই কথা বললে শিউরে ওঠেন। হুদহুদের থেকেও তীব্র, বাতাসের সর্বোচ্চ গতি ছিল ঘন্টায় ২৬০ কিলোমিটার। এক দিকে ভারতের পূর্ব উপকূল আর অন্য দিকে বাংলাদেশ আর মায়ানমার – এই বিশাল এলাকা লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল সেই ঝড়। অবশ্য সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়েছিল উড়িষ্যায়।

সায়ন : সেবার উড়িষ্যায় মারা গেছিলেন অনেকে?

সুবল : সেটা তোমাদের জন্মের আগের ঘটনা, তাই তোমরা সেই সুপার-সাইক্লোনের কথা জানোনা। সেবার ঝড়ে সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল, ষোল থেকে কুড়ি ফুট উঁচু ঢেউ আছড়ে পড়েছিল উপকূলে। সেই জল প্রবল বেগে ঢুকে গেছিল উপকূল থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার পর্যন্ত ভেতরে। ষোল লাখ ঘরবাড়ি আর দু হাজারের বেশি বাঁধ ভেঙে দিয়েছিল সেই জলোচ্ছ্বাস। বহু শহর আর গ্রামডুবে গেছিল বন্যায়। জলে ভাসিয়ে নিয়ে আসা গাছপালা আর কাদার তলায় চাপা পড়েছিল অনেক ঘরবাড়ি।

অর্ণব : আর প্রাণহানি? কতো?

সুবল : বেসরকারি হিসেবে তিরিশ হাজার, সরকারি গুনতি অনুযায়ী হাজার দশেক। সবথেকে বেশি প্রাণহানি জগতসিংপুর জেলায়।

(ক্ষণিক নিস্তব্ধতা)

চন্দন : সুবলদা, তোমার কথা শুনে আমরাই শিউরে উঠছি। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার।

অর্ণব : ওইরকম ঝড় আবারও হতে পারে, তাই না?

সুবল : হ্যাঁ, হতেই পারে। কিন্তু তোমরা খেয়াল করেছ নিশ্চয় ১৯৯৯ সালে যেখানে হাজার হাজার মানুষ মারা গেলেন, তার পনেরো বছর পরে ২০১৪র ঝড়ে উড়িষ্যায় একজনও মারা যাননি।

সায়ন : এই ম্যাজিকটা হল কি করে?

সুবল : দুটো কারণ আছে। এক, ২০১৪র ঝড় আছড়ে পড়েছিল অন্ধ্র উপকূলে,উড়িষ্যায় তার জোর একটু কম ছিল। তাহলেও তার শক্তি হেলেফেলা করার মতো ছিলনা। দুই, আগেরবারের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে উড়িষ্যা প্রস্তুত ছিল মোকাবিলা করার জন্য।

অর্ণব : ওই শক্তিশালী ঝড়, মানুষ কিভাবে তার মোকাবিলা করতে পারে? ঝড় থামাবার কোন উপায় তো এখনও আবিস্কার হয়নি।

সুবল : ঝড় থামানো যায়না বটে, কিন্তু আত্মরক্ষা করা যেতে পারে। উড়িষ্যায় সরকার আর সাধারন মানুষ মিলে তাই করেছিলো।

সায়ন : সেটা কিরকম?

সুবল : প্রথমত উপকূল অঞ্চল থেকে অধিবাসীদের যথাসম্ভব সরিয়ে নেওয়া, সেটা করা হয়েছিল যাকে বলে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। দ্বিতীয়ত, উপকূল অঞ্চলে বিপর্যয়-কালীন শিবির তৈরি করা হয়েছে যেখানে মানুষ ঝড় বা বন্যার সময় আশ্রয় নিতে পারে। গ্রামে গ্রামে ঘোষণা করে সকলকে আশ্রয় শিবিরে চলে যেতে বলা হয়। এই শিবিরগুলোতে গৃহপালিত গরু ছাগল হাঁস মুরগী রাখার ব্যবস্থাও থাকে।

সায়ন : আশ্রয় শিবির মানে কি ইট সিমেন্টের তৈরি বাড়ি? আঠারো-কুড়ি ফুট উঁচু ঢেউ এলে সে বাড়িও তো ডুবে যাবে।

সুবল : আমাদের এলাকাতেও আছে আশ্রয় শিবির। বৃষ্টিটা একটু ধরুক, তোমাদের দেখিয়ে আনবো কি রকম বাড়ি বানানো হয় বিপর্যয়ের কথা ভেবে।

সায়ন : তোমার কিন্তু খুব স্মৃতিশক্তি সুবলদা। এতো সব কথা মনে রেখেছ কি করে?

চন্দন : সুবলদা যা শোনে সব মনে রাখতে পারে। তা ছাড়াও খবরের কাগজে বিপর্যয়ের খবর ছাপা হলে বা বইয়ের খোঁজ পেলে সেগুলো জোগাড় করে পড়ে। বলে এখানেও বিপর্যয় মোকাবিলার সব ব্যবস্থা করতে হবে।

অর্ণব : সুবলদা, বৃষ্টি কিন্তু কমে গেছে। এখন তোমাদের আশ্রয় শিবিরদেখতে যাবো।

সপ্তম অংশ

(খোটির পথ, ছাতার ওপর টুপটাপ বৃষ্টির শব্দ, ভিজে বালির ওপর জুতোর আওয়াজ। বাতাসের জোর আগের থেকে কম, এখন খুব জোরে কথা বলতে হচ্ছে না)

সায়ন : আমরা এখন কোন দিকে যাচ্ছি?

অর্ণব : সিম্পল। সমুদ্র যেদিকে তার উলটো দিকে যাচ্ছি।

সুবল : আমরা খোটি থেকে বাঁধ পেরিয়ে গ্রামে যাচ্ছি। এই গ্রামটার নামও নারায়নপুর। এবার খেয়াল করো সমুদ্রের জল জোয়ারের সময় যতটা আসে, খোটির ঘরগুলো তার থেকে অন্তত এক মানুষ উঁচু। সেখান থেকে বাঁধের উচ্চতা আরও কুড়ি ফুট মত। অর্থাৎ বাঁধের ওপর উঠলে আমরা জলের থেকে পঁচিশ ফুট উচ্চতায় থাকছি। বড় মাপের জলোচ্ছাস হলে আমরা খোটি থেকে গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারি।

অর্ণব : তা হলে গ্রামের সব কটা বাড়ীই নিরাপদ? যে কোনটায় গিয়ে ঢুকে পড়লেই হলো?

সুবল : তুমি যখন বিপর্যয় মোকাবিলার কথা ভাবছো তখন সবথেকে খারাপ অবস্থার কথা ভেবে তৈরি থাকতে হবে। ধরো আমরা গ্রামে আশ্রয় নিয়েছি এবং জলোচ্ছাস কুড়ি ফুট পর্যন্ত উঁচু, কিন্তু জল প্রবল শক্তিতে বাঁধে ধাক্কা দিলো এবং কোন দুর্বল জায়গা ভেঙে দিলো। তখন আমরা কি করবো?

সায়ন : ওরে বাবা! এতো ভয় দেখাচ্ছ কেন আমাদের?

সুবল : ভয় দেখাচ্ছি না, সতর্ক থাকতে বলছি। এখন আমরা বাঁধের ওপরে দাঁড়িয়ে, একটু দূরে একটা পাকা বাড়ি দেখতে পাচ্ছো উঁচু মত?

অর্ণব : হ্যাঁ, ওটাই কি আশ্রয় শিবির?

সুবল : ঠিক বলেছ। লক্ষ্য করো বাড়িটা অনেকগুলো ঢালাই খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আর রাস্তা থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। বন্যা এলেও ওই বাড়ি জলের ওপরে থাকবে।

অর্ণব : সিঁড়ির পাশ দিয়ে একটা ঢালু রাস্তা উঠে গেছে ঘর পর্যন্ত, ওটা কেন করা হয়েছে?

সুবল : ওকে বলে র‍্যাম্প, যারা সিঁড়ি উঠতে পারেনা তাদের জন্য। প্রয়োজনে গরু ছাগলও নিয়ে যাওয়া যাবে আশ্রয় শিবিরে।

সায়ন : সিঁড়ি আর ঢালু পথের দুপাশে লোহার রেলিং লাগিয়েছে কেন?

সুবল : ওপরে ওঠার সময় ধরে উঠবে। যখন বিপর্যয়ের কথা ভাবছ, সব রকম সম্ভাবনা ভাবতে হবে। ভূমিকম্পের সময় ইটের রেলিং ভেঙে পড়তে পারে, লোহা তুলনায় হালকা।

সায়ন : বাড়িটার ছাদে কি ওই জন্য লোহার রেলিং?

সুবল : ঠিক বলেছ। এক ফুট ইটের গাথনি দিয়ে তার ওপর লোহার রেলিং দেওয়া আছে।

অর্ণব : তার মানে এই বাড়ি ভূমিকম্প সহ্য করতে পারবে?

সুবল : এই অঞ্চলের হিসেবে পারবে। সব অঞ্চলে ভূমিকম্পের প্রবণতা এক রকম নয়, তাই প্রবণতা অনুযায়ী বাড়ির নকশা করলে নিরাপদ থাকা যায়। ওই নকশা কিন্তু সবসময় বিশেষজ্ঞকে দিয়ে করাতে হয়। এই বাড়ির ভিত, খুঁটি, দেওয়াল, ছাদ সবএকজন বিশেষজ্ঞর পরামর্শ অনুযায়ী করা হয়েছে।

অর্ণব : বাড়ির ভেতরে যাওয়া যাবে? একটু দেখতাম কিরকম নকশা করেছেন বিশেষজ্ঞ।

সায়ন : (হাসি) আসলে অর্ণব শিগগিরি বাড়ি বানাবে তো, তাই বাড়ির নকশা দেখতে চাইছে।

অর্ণব : সব কিছুতে ইয়ার্কি মারিস না সায়ন। সুবলদা, চলো না প্লিজ ভেতরে।

সুবল : এসো এইদিকে।

(দরজার তালা এবং শেকল খোলার আওয়াজ)

সুবল : দাঁড়াও, আলো জ্বালাই। জানলা খুলে দাও তো দুএকটা।

(কাঠের পাল্লার জানলা খোলার শব্দ)

সুবল : এবার লক্ষ্য করো থাম আর কড়িকাঠগুলো কেমন শক্তপোক্ত। ঘরটাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে, দেওয়ালগুলো উঠে গেছে ছাদ পর্যন্ত। ছাদের ওজনটা দেওয়ালের ওপরেও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর দেওয়ালগুলোর ভেতরেও লোহা দিয়ে মজবুত করা হয়েছে। তাই বাড়িটা যদি ভূমিকম্পে দুলতে থাকে তাহলেও দেওয়াল বা ছাদ সহজে ভাঙবে না।

সায়ন : আমি বাবার কাছে শুনেছি মহারাষ্ট্রের লাতুরে অনেক বছর আগে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছিলো। সেখানে বহু মানুষ বাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছিলেন।

সুবল : ঠিক শুনেছ। সালটা ছিল ১৯৯৩, সেপ্টেম্বর মাস। লাতুর আর ওসমানাবাদ জেলায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলো খুব। মারা গেছিলেন প্রায় দশ হাজার আর আহতের সংখ্যা ছিল তিরিশ হাজার। ভূমিকম্প হয়েছিল শেষ রাতে, যখন সবাই ঘুমে অচেতন। অনেক ক্ষেত্রে যাঁরা ঘরের বাইরে শুয়েছিলেন তাঁরা বেঁচে জান। মারা যান যাঁরা ঘরের ভেতরে শুয়ে ছিলেন।

অর্ণব : এটা কেন হল? ঘরের ভেতর কি ছিল?

সুবল : গ্রাম অঞ্চলে অনেকেই পুরনো দেওয়ালের ওপর ঢালাই ছাদ করে নিয়েছিলেন। ভূমিকম্পে দেয়াল ধসে যায়, ভীষণ ভারি ঢালাই ছাদ হুড়মুড় করে নেমে আসে ঘুমন্ত মানুষের ওপর।

সায়ন : কি ভয়ঙ্কর!

অর্ণব : আমরা একটা কাজ করতে পারি কলকাতায় ফিরে গিয়ে। এখানে এসে যা দেখলাম আর সুবলদার কাছে যা শুনলাম সব কিছু লিখে কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপতে দিতে পারি। অন্তত আমাদের বন্ধুরা জানুক বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য কেমন ঘরবাড়ি বানাতে হয়, আরো কি কি ব্যবস্থা নিতে হয়।

সুবল : তোমরা সেটা করলে একটা কাজের কাজ হবে। গ্রামের বাড়ি একরকম, মাপে ছোট আর মালমসলা স্থানীয়। আজকাল শহরে তো বটেই, গ্রামেও অনেকে বড় পাকা বাড়ি করেন। সেক্ষেত্রে কেউ ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে বাড়ির নকশা করান, কেউ কেউ আবার নিজের ইচ্ছেমত বাড়ি বানিয়ে নেন। ইঞ্জিনিয়ারের তৈরি নকশাও অনেক ক্ষেত্রে মেনে চলা হয় না, কেউ কেউ বেআইনি পথে বাড়ি তৈরি করে নেন। এইসব কাজ করে অনেকের প্রাণের ঝুঁকি নেওয়া হয়।

সায়ন : আমরা লিখবো, অবশ্যই লিখবো। যদি দশটা মানুষকেও সচেতন করা যায়, সেটাই লাভ।

সুবল : খুব ভালো। তোমাদের লেখা ছাপা হলে আমাকে পাঠিও, আমার সংগ্রহে রেখে দেবো। চলো, এখন বাসায় ফেরা যাক। আবার বৃষ্টি আসবে মনে হচ্ছে।

****